অলকানন্দা মালা

আস্কর আলীর পূর্বপুরুষদের অনেকেই সাধক ও সুফী দরবেশ ছিলেন।

আস্কর আলী পণ্ডিত একাধারে ছিলেন একজন সুরকার, পদকার, পুঁথিকার ও কণ্ঠশিল্পী।

পুঁথিধর্মী এ বইয়ে নিজের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় তুলে ধরেছেন তিনি। বইটি তার মৃত্যুর প্রায় আড়াই দশক পর ১৯৫১ সালে প্রকাশ পায়।

১৯২৬ সালের রমজান মাসের কোনো এক রাতে প্রস্থান করেন মহাত্মা আস্কর আলী ফকির।

এই সুফী সাধক ঘুমিয়ে আছেন চট্টগ্রামের পটিয়ার শোভনদন্ডী গ্রামে।

'কী জ্বালা দিয়া গেলা মোরে...' প্রথম লাইনটি গাইলেই দ্বিতীয় লাইন আর বলে দিতে হয় না। আপনাআপনি মনে পড়ে যায়, 'নয়নের কাজল পরাণের বন্ধুরে, না দেখিলে পরাণ পোড়ে...'। চটগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার এই গানটির জনপ্রিয়তা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এমন আরও অনেক জনপ্রিয় গানের গীতিকার আস্কর আলী পণ্ডিত। তার জন্ম সাল ও স্থান নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কারও মতে তিনি ১৮৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন লোকগানের এই কিংবদন্তির ১৮৫৫ সালে জন্ম হয়েছে। একইভাবে কেউ বিশ্বাস করেন তার জন্ম হয়েছে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার পুরানগড়ে। আবার কেউ বলেন এ কিংবদন্তির পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল সাতকানিয়ায়। পরে তারা এসে শোভনদন্ডী গ্রামে থিতু হন। সেখানেই জন্ম হয় পণ্ডিতের।

আস্কর আলীর দাদা ও পরদাদার নাম যথাক্রমে ডোমন ফকির এবং নাছির মোহাম্মদ। তার বাবার নাম মোশাররফ আলী। তার ছিল ৬ ছেলে মেয়ে। তারা হলেন আমির জান, আস্কর আলী, রহিম জান, ফুল জান, সাহেব জান ও মেহের জান। আস্কর আলীর পিতৃভাগ্যের কথা বলতে গেলে ওই গানটি মনে পড়ে যায়, 'পিতা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে চইলা গেল ফিরা আইলো না...'। আস্কর আলীর বয়স যখন ৯ তখন তাকে রেখে পরপারে পাড়ি জমান তার পিতা মোশাররফ আলী। আস্কর আলী তার রচিত 'জ্ঞান চৌতিসা' গ্রন্থে গানে গানে এসব কথা বলে গেছেন। পরিচয়পর্বে তিনি লিখেছেন:

তথা হীন মুই দীন আস্কর আলী নাম
দুঃখের বসতি এই শোভনদন্ডী গ্রাম।
ধনজনহীন আর বুদ্ধি বিদ্যাহীন
তেকারণে নিজ কর্ম্মে নয় মনলিন।
জনক মোসরফ আলী গুণে সুরচির
তান পিতা নাম শ্রেষ্ঠ দোলন ফকির।

আস্কর আলীর পড়াশুনা সম্পর্কেও তেমন কিছু জানা যায় না। এ বিষয়েও নির্ভর করতে হয় তার 'জ্ঞান চিতৌসা'র ওপর। সেখানে তিনি তার গানে উল্লেখ করেছেন:

ধনজন হীন বিদ্যা শিখিতে না পারি
কিঞ্চিত দিলেক প্রভু সমাদর করি।

আস্কর আলীর পূর্বপুরুষদের অনেকেই সাধক ও সুফী দরবেশ ছিলেন। বলা যায়, আধ্যাত্মবাদ ছিল তার রক্তে। এছাড়া তিনি ছিলেন মাইজভান্ডার শরীফের ভক্ত। তার পীর ছিলেন মুজিবুল্লাহ সুলতানপুরী। কবি চন্দনাইশের সাতবাড়িয়া গ্রামের প্রখ্যাত পীর ফয়জুর রহমানের দরবারেও যাতায়াত করতেন বলে জানা যায়। এছাড়া মাইজভান্ডারী তৃরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারীর ভক্ত ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন তার অন্যতম খলিফা।

মাইজভান্ডার দরবারের প্রতি ভক্তির কথা আস্কর পণ্ডিত নিজের লেখাতে স্পষ্ট করে গেছেন। নিজের গুরু মুজিবুলা মাইজভান্ডারী সাহেবের নাম উল্লেখ করে তাতে লিখেছেন,

কয় হীন আস্কর আলী সুখ ছড়ি ফকির
মুরশিদ আমার মুজিবুলা মাইজভান্ডারী পীর

ব্যক্তিগত জীবনে আস্কর আলী তিন বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তার প্রথম স্ত্রীর নাম রাহাতুন নেছা। দ্বিতীয় স্ত্রীর মিছরি জান ও তৃতীয় স্ত্রী আতর জান। প্রথম স্ত্রীর ঘরে লতিফা খাতুন অরফে লেইস্যা খাতুন নামে এক কন্যা সন্তান জন্মায় তার। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে জন্মায় আবদুল

ছামাদ ও বাচা মিয়া নামে দুই সন্তান। আর তৃতীয় স্ত্রীর ঘরে আবদুর রশিদ, বাদল, ছমন খাতুন সহ ছয় সন্তান।

আস্কর আলী পণ্ডিত একাধারে ছিলেন একজন সুরকার, পদকার, পুঁথিকার ও কণ্ঠশিল্পী। জীবদ্দশায় বেশকিছু বই রচনা করেছেন তিনি। তবে তার অনেকগুলো সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। যেগুলো উদ্ধার করা গেছে তারমধ্যে বর্গাশাস্ত্র, নন্দবিহার, নন্দবিলাস, গীত বারমাস, সতী সঙ্গিনী, হাদিস বাণী ও নাটক কাজীর পাট উল্লেখযোগ্য। তবে তার যে বইটির কথা বারবার আসে সেটি হলো জ্ঞান চৌতিসা। পুঁথিধর্মী এ বইয়ে নিজের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় তুলে ধরেছেন তিনি। বইটি তার মৃত্যুর প্রায় আড়াই দশক পর ১৯৫১ সালে প্রকাশ পায়।

বাউল দুই প্রকার। কেউ কেউ ঘরবাড়ি ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেয়। আরেক দল আছে যারা গৃহকর্ম ঠিক রাখার পাশাপাশি বাউলিয়ানা লালন করেন। আস্কর আলী ছিলেন সেরকম। বেশকিছু শিষ্যও ছিল তার। তাদের নিয়েই কাটত দিন। তবে পথটা সহজ ছিল না। আস্কর আলীর বাড়িতে শিষ্যদের নিয়ে নিয়মিত গানের আসর বসানোয় তার ওপর নাখোশ ছিল শরীয়তপন্থীরা। গান বাজনা হারাম, এই অজুহাতে তারা পণ্ডিতের সংগীত বন্ধে উঠেপড়ে লেগেছিল। কোনো কাজ না হলে তারা আস্কর আলীর গান-বাজনা বন্ধে মির্জারখিল দরবার শরিফের জাহাঙ্গীরিয়া তরিকার পীর ও রৌশনহাটের ছুফিয়া দরবার শরিফের পীরের দ্বারস্থ হয়। তাদের নিয়ে সালিস বসায়। সেদিন পণ্ডিতের গানের পক্ষে বিপক্ষে দীর্ঘ বাহাস হয়। শেষ পর্যন্ত জিতে যান পণ্ডিত। বাহাস শেষে দুই পীর সিদ্ধান্ত নেন পণ্ডিতের গান-বাজনায় কোনো বাধা দেওয়া যাবে না।

সেদিন আরও একটি রায় আসে আস্কর আলীর গানের ওপর। ওই দিন রাতে একদিকে চলছিল ওয়াজ মাহফিল। অন্যদিকে আস্কর পণ্ডিত বসিয়েছিলেন গানের আসর। গান-বাজনার শব্দে ওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। এতে স্থানীয় মুসল্লিরা ক্ষুব্দ হন। একপর্যায়ে পণ্ডিতকে লাঞ্ছিত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাধ সাধেন ওয়াজ মাহফিলের বক্তা আমিনুল্লাহ শাহ। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলেন, 'ওয়াজত আঁই যা হইয়ি, আস্কর আলীও গানত তা হইয়েদে। আঁই হইয়ি ভাবত, তে হইয়ে রঙ্গত।' প্রমিত বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়, 'ওয়াজে আমি যা বলেছি, আস্কর আলীও গানে তা বলেছে। আমি বলেছি ভাবে, সে বলেছে রঙ্গে।'

আস্কর আলীর পুঁথি জ্ঞান চৌতিসা থেকে জানা যায় আর্থিকভাবে বেশ সচ্ছল ছিলেন তিনি। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ যাকে বলে। জায়গা জমির পাশাপাশি ছিল দোতলা দালান। পণ্ডিত লিখেছেন,

পুত্র কন্যা আদি যত নাহি কোন উন
আল্লায় দিলেক তানে সেকান্দরি গুণ
ধনে মানে উনা কিছু নাহিক তাঁহার।
দোতালা তেতালা বাড়ি করিল উহার

আস্কর আলী পণ্ডিতের উপার্জনের পন্থা ছিল; নিজের প্রায় দেড় দ্রোণ ধানিজমি এবং কবিরাজি চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর গান ও কাহিনিভিত্তিক কাব্যের প্রধান বিষয় মানুষ। মানুষকে কেন্দ্র করে তাঁর চিন্তায় ও আদর্শে দার্শনিক প্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

২০১১ সালে আস্কর আলী পণ্ডিতের স্মারকগ্রন্থে (তৎকালীন বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন) বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি তাঁর বাণীতে লিখেছেন - আস্কর আলী পণ্ডিত এ জনপদের একজন সুফীসাধক। উঁচুমাপের এই লোককবি আমাদের কাছে সমধিক আত্মার মিলনস্থল। তাঁকে এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বলা চলে।

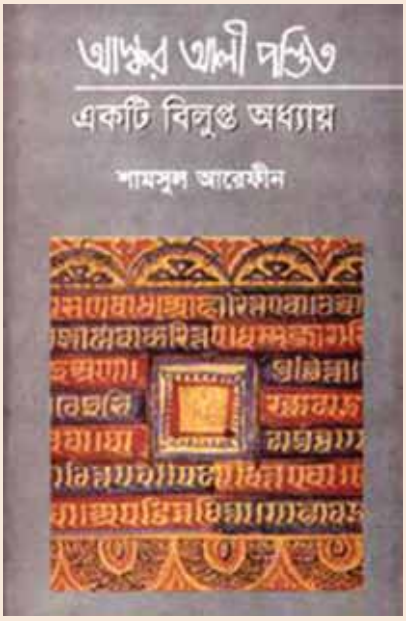

এক বাণীতে জাতীয় সংসদের হুইপ (২০১৮-২০২৩) সামশুল হক চৌধুরী লিখেছেন- ছোটবেলা থেকে তিনি আস্কর আলী পণ্ডিতের গানের সাথে পরিচিত। তাঁর ধ্যান ও জ্ঞানের একাংশ তাঁকে ঘিরে। আমি আজ এলাকার জনপ্রতিনিধি। তাই তাঁর প্রত্যেক বাণী ও ব্রত প্রচারে এক গভীর টান অনুভব করি।

তিনি আরও বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বড়োমাপের সুফীসাধক ও লোককবি হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশে তিনি উপযুক্ত মূল্যায়ন পাননি। জোটেনি কোন পদক বা পুরস্কার। তাঁকে নিয়ে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদনের কোন প্রতিষ্ঠানও উদ্যোগ কখনো নেয় নি।

আস্কর আলী পণ্ডিত এই অঞ্চলে সাহিত্যসাধনায় এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

আস্কর আলীর ইহলোক ত্যাগের গল্পটা অন্যরকম। চট্টগ্রামে ইসলামী গানের আসরকে বলা হতো ধারা। জীবদ্দশায় প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ধারা হতো পণ্ডিতের ঘরে। সেদিন ছিল রমজান মাসের এক বৃহস্পতিবার। সেদিনও ধারা হওয়ার কথা। কিন্তু পণ্ডিত বাধ সাধেন। রাতে দোকানে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভক্ত অনুরাগীদের আগামী বৃহস্পতিবার ধারা বন্ধ থাকবে বলে জানান। সেইসঙ্গে তাদের পরের শুক্রবার আসতে বলেন। সুফী সাধকের মুখে এ কথা শুনে অবাক হন সবাই। কারণ জানার কৌতূহল নিয়েই তারা ফিরে যান। সবাই চলে গেলেও একজনকে যেতে দিলেন না সুফী আস্কর আলী। তাকে বললেন কবস্থানে গিয়ে কবর খুঁড়তে। সেইসঙ্গে ঘটনাটি গোপন রাখতে বললেন।

বৃহস্পতিবার এলো। আস্কর পণ্ডিত চায়ের দোকানে সবাইকে নিয়ে চা খেলেন। ঘরে বসালেন ধারার আসর। সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মন খুলে গান গাইলেন। এরপর সবার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিলেন। বাড়ি ফিরে পুত্রবধূর কাছে জানতে চাইলেন পাটি ও চাদর ধুয়ে রাখতে বলেছিলেন সেগুলো রেখেছে কি না। রাখলে আনা হোক। শ্বশুরের আদেশ পেয়ে আগে ধুয়ে রাখা পাটি ও চাদর নিয়ে এলেন পুত্রবধূ। পণ্ডিত তখন চাদর পাটি উত্তর দক্ষিণ করে পাততে বলে তার মেয়েকে ডেকে পাঠান। পাশের বাড়ি থেকে মেয়ে এলে কাছে বসিয়ে আস্কর আলী বলেন, আমার ডান পাশে খনন করে দেখ মাটির নিচে একটা ঘটি (কলসি) আছে। কলসি ভর্তি রৌপ্য মুদ্রা আছে। এ মুদ্রা তোমার জন্য। তুমি তোমার নিজের জন্য এ মুদ্রা ব্যয় করো।

এরপর জানালেন বাম পাশে খনন করলে আরও একটি কলসি পাওয়া যাবে। তাতেও রূপার মুদ্রা আছে। সেগুলো যেন তার কুলখানিতে খরচ করা হয়। নির্দেশনা দেওয়া শেষে আর কথা বাড়ালেন না পণ্ডিত। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উপস্থিত লোকজন খেয়াল করলো আস্কর আলী পণ্ডিতের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ের জামাই চাদর তুলে দেখলেন ধরাধাম ত্যাগ করেছেন পণ্ডিত। খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই মানুষের ঢল নামলো এই সুফী সাধককে এক নজর দেখতে। এভাবেই ১৯২৬ সালের রমজান মাসের কোনো এক রাতে প্রস্থান করেন মহাত্মা আস্কর আলী ফকির।

আস্কর আলীর মৃত্যু নিয়ে আরও একটি গল্প শোনা যায়। মৃত্যুর পর নাকি তার মুখ সামান্য হা হয়েছিল। এতে উপস্থিত অনেকে বলাবলি করছিলেন, পণ্ডিত জীবদ্দশায় পাপকার্যে লিপ্ত ছিলেন বলেই মুখ বন্ধ হয়নি। এ কথা যখন চলছিল ঠিক তখন শব্দ করে তার হা বন্ধ হয়ে যায়। অমনি থেমে যায় শোরগোল।

এই সুফী সাধক ঘুমিয়ে আছেন চট্টগ্রামের পটিয়ার শোভনদন্ডী গ্রামে। সেখানে যেতে হলে পটিয়া সদর বাস স্টেশন থেকে চেপে বসতে হবে সিএনজি অটোরিকশাতে। আর রিকশায় যেতে চাইলে রৌশন হাট থেকে উঠতে হবে। একটু ভেতরে গেলেই পেয়ে যাবেন শোভনদন্ডী গ্রাম। গ্রামের একটু ভেতরে একটি পুকুর। তার পশ্চিমেই মাজার। সেখানে ঘুমিয়ে আছেন সাধক আস্কর আলী।